পার্থের ই-মেইল এবং স্টালিনের ঘড়ি

আমার যত ভাবনা

এবিএম মূসা

রবীন্দ্রনাথের শ্যামা নৃত্যনাট্যের শুরুতে রয়েছে রাজার প্রহরী এক ব্যক্তির পেছনে ধাওয়া করছে। প্রহরীর মুখে একই কথা, 'চোর চাই, চাই চোর। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে।' চোর কোথায় পাবে, সে তো নাগালের বাইরে। কিংবা কে জানে ব্যাটা প্রহরীই হয়তো আসল চোর। এখন রাজার মনিহার চুরি গেছে, চোর যেই হোক অথবা যাকেই হোক ধরতে হবে। বেচারা বিদেশী বজ্রসেন ব্যবসা উপলক্ষে শহরে এসেছিল। প্রহরী এই পেয়েছি বলে তাকেই ধরে নিয়ে গেল। তার বক্তব্য, 'দুদিন রবে কারাগারে তারপর যা হয় তা হবে।' তারপর অনেক কথা সেসব যারা নৃত্যনাট্যটি দেখেছেন বা পড়েছেন তারা জানেন। অন্যদের বাকিটুকু না জানলেও চলবে। তবে এটুকু জেনে রাখুন, রবীন্দ্রনাথ সেই কোন অতীতকালের একজন ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল বলে একটি নৃত্যনাট্য লিখেছিলেন এখনও তা ঘটছে। কি রকম ঘটছে তার অনেক উদাহরণ রয়েছে। এখনকার একটি উদাহরণ হচ্ছে সেকালের বজ্রসেন একালের পার্থ।

প্রথমে একটি ভূমিকা দিয়ে রাখি। আওয়ামী লীগের সভায় গ্রেনেড হামলা হয়েছে। কারা করেছে, কেন করেছে তা নিয়ে প্রায় দেড় মাস ধরে অনুসন্ধান আর তদন্ত চলছে। সরকার তদন্ত করছে এবং সেজন্য একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন করেছে। বেসরকারিভাবে আইনজীবীরা যারা এদেশের জটিল অনেক সমস্যার সমাধানের পথটি বাৎলাতে পারদর্শী তারাও একটি তদন্ত কমিটি করেছেন। সেই তদন্ত চলছে এবং চলবে। শুনছি সরকারের নিযুক্ত মহামান্য বিচারপতি নাকি একটি রিপোর্টও তৈরি করে ফেলেছেন যা শুধু সরকারই জানবে। তারপর হয়তো কিয়দংশ বা পুরোপুরি সেই রিপোর্ট প্রকাশ করবে। অথবা পাকিস্তানের জন্মকাল থেকে আজ পর্যন্ত গঠিত সব কমিশনের রিপোর্টের মতো ধামাচাপা পড়বে। এমনও হতে পারে সেই রিপোর্টটি অজ্ঞাতে গায়েবও হয়ে যেতে পারে। বেসরকারি তদন্তকারী সংস্থাগুলো কতখানি তথ্য পাবে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরির তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। তার প্রধান কারণ, তারা যেখানে যাকে জেরা করা দরকার, সেখানে এবং তাদের অনেকের কাছেই পৌঁছতে পারবে না। ইতিপূর্বে আমি লিখেছিলাম, গ্রেনেড হামলার তদন্ত আর তথ্যানুসন্ধানের পদ্ধতি হবে আলাদা। প্রথমটি যে কেউ করতে পারেন। দ্বিতীয়টি তথ্যের মাধ্যমে ঘটনা ঘটানোর মূলে যাওয়া যা একটি কঠিন পেশাদারি কাজ। তা পারেন শুধু বিশেষজ্ঞরা, আর পারে আমাদের আইন-শৃংখলা বাহিনী। দ্বিতীয় শ্রেণীর এই বিশেষজ্ঞরা অপরাধী চিহ্নিত করণে ও গ্রেফতারে পারদর্শী। অন্তত দেশের অভ্যন্তরে ঘটিত সাময়িক অপরাধের ক্ষেত্রে তাদের তৎপরতাই অধিকতর কার্যকর হতে পারে। গ্রেনেড হামলার ব্যাপারে সেই তথ্যানুসন্ধানে বিদেশী অনুসন্ধানীরাও এসেছিলেন। শুনছি আরও আসবেন। যারা এসেছিলেন তারা কী পেলেন আর নিয়ে গেলেন তা আজও জানা যায়নি, আদৌ জানাবেন কিনা জানি না। অপরদিকে আমাদের দেশর তথ্যানুসন্ধানী গোয়েন্দা সংস্থা আর অপরাধী শনাক্ত করার কাজে পারদর্শী বলে কথিত ব্যক্তিরা এ পর্যন্ত কী তথ্য পেয়েছেন তা জানি না। তবে কী করছেন তা বোঝা গেছে পার্থকে গ্রেফতারের পর। এই একটি কাজ তাদের একমাত্র সাফল্য।

তথ্যানুসন্ধানে ক্লু বা সূত্র বলে একটি কথা আছে। যারা গোয়েন্দা কাহিনী পড়েন তারা জানেন অপরাধী ঘটনাস্থলে ক্লু রেখে যায়, কোন চিহ্ন থেকে যায় যা তাদের শনাক্ত করতে সাহায্য করে। এছাড়া অনুসন্ধানের সূত্র ধরেও অপরাধীর ঠিকানা পাওয়া যায়। এসব ক্লু হচ্ছে অপরাধীদের হাতের ছাপ, ফেলে যাওয়া আধখাওয়া সিগারেটের টুকরা, এমনকি দরজার সঙ্গে লেগে থাকা একগাছি চুল ইত্যাদি। শার্লক হোমস বা সত্যজিতের ফেলুদা, আমাদের ছোটকালের কিরীটি রায় এভাবে রহস্যভেদ করতেন বলে গোয়েন্দা বইতে পড়েছি। সেদিনের নৃশংস হামলার পর যে বিশেষ ক্লুটি তদন্তকারীরা অনুসন্ধানে কাজে লাগাতে পারতেন সেটি হল অপরাধীদের ফেলে যাওয়া গ্রেনেডগুলি। সেগুলি কোত্থেকে এলো তার খোঁজ পাওয়া যেত, থাকত হাতের ছাপ বা অন্য কোন নিশানা। সেগুলি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। কেন করা হয়েছে, সেগুলির উৎস সন্ধান করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে এখন বিতণ্ডা চলছে একজন প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ ও সেনা দফতরের মতে, সেনা দফতরের মাঝে। সেনাবাহিনী কী করে, কোথা থেকে কী পায়, তাদের কাছে কী থাকে, সেগুলি কীভাবে ব্যবহৃত হয় সেসব আমাদের মতো সাধারণ মানুষ জানতে পারে না, জানার কথাও নয়। তবে একজন সেনাধ্যক্ষ যার আওতায় ও নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর সবই ছিল তিনি নিশ্চয়ই জানেন। এই কারণে মঙ্গলবারে যুগান্তরে প্রকাশিত তার উত্থাপিত প্রশ্নগুলি জনগণের মাঝেও অনেক প্রশ্নের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এমনকি সেনা দফতর থেকে প্রচারিত ছোট্ট একটি ব্যাখ্যা সেসব প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দেয়নি। এখন আমার নতুন প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার নিয়োজিত বিচারপতি বা কমিশন প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষের এবং সেনা দফতরের বক্তব্যগুলি তদন্তের সাহায্যার্থে বিবেচনা করবেন কী? তিনি তদন্ত চলাকালে বহু জায়গায় গিয়েছেন, বহুজনকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ উত্থাপিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর কি সংশ্লিষ্ট মহলে চাইতে পারবেন? সেনাবাহিনীকে জড়িয়ে যদি অহেতুক সন্দেহের ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তবে বাদানুবাদ বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট সব মহল কমিশনের বিচারকের তদন্তের আওতায় বিষয়টি ন্যস্ত করার প্রস্তাব করতে পারেন। অপরদিকে বেসরকারি তদন্ত কমিশন যে এই ব্যাপারটির ধারেকাছেও যেতে পারবে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আপাতত দুটি তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের জন্য অধীর আগ্রহে জাতি অপেক্ষা করে থাকবে। তারপরও সেসব রিপোর্ট, যদি প্রকাশিত হয় তবে নতুন করে বাকবিতণ্ডা শুরু হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

সব তদন্তের অতীত জানা আছে ভবিষ্যৎও অনুমান করতে পারি, এ নিয়ে অধিকতর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এবার তথ্যানুসন্ধান, যা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমাদের তথ্যানুসন্ধানী প্রতিষ্ঠানগুলিও যথা ডিবি, সিআইডি ইত্যাদি ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার আসামি খুঁজছে। সেই ভয়াবহ ঘটনাটি যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে ঘটেছে এবং বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রহস্যের সমাধান করতে হবে তা তদন্ত কমিটি গঠন করা থেকেই বোঝা গেছে। অবশ্য সব কথা জনগণকে বলতে হবে না। আমাদের দেশের রাজনৈতিক সচেতন জনগণ সবই জানে, সবই বোঝে। উর্ধ্বতন মহলে কে কী বলছে বা করছে শুধু তা দেখে যায় আর মনে মনে হাসে। জনগণের বোঝা বা জানার ব্যাপারে সরকার বা রাজনৈতিক মহলের কার্যকলাপ বা চিন্তাভাবনা জড়িত থাকলেও আমাদের অনুসন্ধানকারী গোয়েন্দা বাহিনী বা বিশেষ সংস্থাগুলি রাজনৈতিক অপরাধকেও সাধারণ বা গুরুতর একটি সাধারণ অপরাধের আলোকেই গ্রেনেড হামলার তদন্ত করে যাচ্ছে। এসব তদন্তকারী গোয়েন্দা ও অনুসন্ধানকারী সংস্থাগুলি গ্রেনেড হামলার মূল কারণ রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে তদন্ত করতে পারবে না বা করতে দেয়া হবে না। তারা শুধু অপরাধের সূত্র ধরে অপরাধী খুঁজছেন। এই খোঁজাখুঁজির তাদের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। আমাদের সাধারণ তদন্ত সংস্থা বা পুলিশি শাখাগুলি এসব ব্যাপারে প্রধানত শুধু ধরতেই থাকে, সন্দেহভাজনের খোঁজে মরিয়া হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্য অপরাধী পাওয়া যাক বা না যাক কাউকে না কাউকে ধরতেই হবে। সেই ধরাটি যদি ক্ষমতাসীনের প্রতিপক্ষ হয় তাহলে আরও ভাল। শ্যামা নাট্যের সেই প্রহরীর মতো তারা চোর চাই বলে হন্যে হয়ে ওঠে। তারপর চোর ধরে আনে। সাক্ষ্য নেই, প্রমাণ নেই, অবশ্য বর্তমান সরকারের নিয়ন্ত্রিত বিচার কার্যাবলীতে তার প্রয়োজন হয় না। তবে চোর ব্যাটাকে স্বীকার করতেই হবে অথবা করিয়ে ছাড়বে ব্যাটা চোর অতিশয় (রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' থেকে)। আরও একটি পদ্ধতি আছে। অপরাধী যদি পাঁচ কড়ি

হয়ে দুই ভাই তিন কড়ি আর দুই কড়িকে বেঁধে এনে পাটীগণিতে যোগের অংকটি কাজে লাগালেই হল। এর বর্তমান আমলের নাম হল গণগ্রেফতার। আর রয়েছে সন্দেহভাজনের তালিকা। যে পুঁচকে সন্ত্রাসী চাক্কু ছাড়া কিচ্ছু দেখেনি তার ঘরে বোমা আবিষ্কার করে সন্ত্রাস দমন অভিযান সফল করতে হবে।

এবার তথ্যানুসন্ধানের জটিলতা নিয়ে আলোচনা যার শিকার পার্থ নামে এক হতভাগ্য যুবক। গ্রহের ফের, কেন যে সে গিয়েছিল একটি সাইবার কাফেতে! ইন্টারনেটে বা ওয়েবসাইটে কেন চাকরির খোঁজ করতে গেল। সেই হল তার কাল, কারণ সেই ওয়েবসাইট বা সাইবার থেকে কেউ না কেউ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর বিরোধীদলীয় নেত্রীকে নাকি প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে মেইল পাঠিয়েছিল। সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক অনুসন্ধানকারী সংস্থাগুলি গ্রেনেড হামলার কয়েক দিন পরই একটি সূত্র পেয়ে বলে উঠল, 'ইউরেকা' এবার পেয়েছি। ধর, ই-মেইল ব্যবহারকারী সবাই সন্দেহভাজন হয়ে গেল। তারপর গ্রেফতার এবং অকথ্য নির্যাতন এবং আধমরা হয়ে মহামান্য আদালতের নির্দেশে হাসপাতালে।

পার্থকে গ্রেফতার আর নির্যাতন নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেয়ার আগে একটি প্রশ্ন করতে চাই। ই-মেইল পাঠিয়ে হুমকি দিয়ে পার্থ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীকে হত্যা করবে বলে জানিয়েছিল। আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে গ্রেনেড ছোড়ার আগে কি কেউ এমন মেইল পাঠিয়েছিল কিংবা টেলিফোনে বা চিঠি লিখে আগাম নোটিশ দিয়েছিল কিনা তথ্যানুসন্ধানীরা এখনও জানাননি। এ নিয়ে আদৌ কোন খোঁজখবর হয়েছে কী? মনে হয় না। তবে তাদের তথ্যানুসন্ধান বা ইনভেস্টিগেশনের এখন পর্যন্ত একমাত্র সাফল্য পার্থকে খুঁজে পাওয়া। তাদের ব্যর্থতা নিয়ে যেসব সমালোচনা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে একটি সাফাই অন্তত দেয়া যাবে একজনকে তো ধরেছি। এখন পরবর্তী কার্যক্রম তার স্বীকারোক্তি আদায় করা। তা হলেই মনে হয় গ্রেনেড হামলার রহস্য উদঘাটিত হবে। বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলি যা পারেনি আমাদের করিৎকর্মা সংস্থা তা এভাবেই পারতে চায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই কার্যক্রম অনুসরণের নিট ফল হচ্ছে বেচারা পার্থ কিছুই স্বীকার করেনি এবং বঙ্গবন্ধু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। অবশ্য তার হাসপাতালে স্থান লাভ নিয়ে অনুসন্ধানকারীরা ও তাদের মুরব্বিরা নানা নাটক করেছে। হয়তো হৃদয়হীন দু-একজন ডাক্তারও সেই নাটকে কুশীলবের ভূমিকা নিয়েছে। যা হোক, আমরা গ্রেনেড হামলা তদন্তে আমাদের দেশীয় বিশেষজ্ঞদের সাফল্যের খাতিরে পার্থ বাবুর স্বীকারোক্তির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। অপরদিকে যদি তারা মনে করেন গ্রেনেড হামলার রহস্য উদঘাটনে তাদের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ তবে যেন অন্তত পার্থদের রেহাই দেন।

অপেক্ষাকালে আমার সম্মানিত পাঠকদের স্বীকারোক্তি সম্পর্কীয় একটি গল্প কিংবা হয়তো সত্যি ঘটনা উপহার দেব। গল্পটি হল এই– রাশিয়ার ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট স্টালিনের ঘড়িটি তার শোবার ঘর থেকে চুরি গেল। স্টালিনের ঘড়ি বলে কথা। রাশিয়ার পুলিশ, কেজিবি, সেনা গোয়েন্দা থেকে শুরু করে সব সংস্থা মাঠে নামল ঘড়ি উদ্ধার করতে। ঘণ্টাখানেক পরে স্টালিন নিজেই ঘড়িটি পেলেন গোসল ঘরে। বেসিনের ওপর কোন সময়ে খুলে রেখেছিলেন মনে ছিল না। কেজিবি প্রধানকে জানালেন ঘড়ি পাওয়া গেছে। গোয়েন্দা প্রধান সবিনয়ে জানালেন, 'মহান প্রেসিডেন্ট, মুশকিল হচ্ছে, আমরা ইতিমধ্যে শ'খানেক ঘড়ি চোর ধরে ফেলেছি। এদের পঞ্চাশ জনের কাছ থেকে কনফেশন মানে চুরির স্বীকারোক্তিও আদায় করে ফেলেছি।' গল্পটির শেষে বলা হয়নি পরবর্তী সময়ে সেই পঞ্চাশ জনকে কোন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল কিনা।